শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

শহীদ মনোরঞ্জন

ফাঁসীর মঞ্চে তৃতীয় শহীদ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 'সাবধানীদের বাঁধ বাঁধার' আর অসাবধানীদের 'কূল ভাঙ্গার' যে দুটি স্রোতধারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে চলে আসছিল, শহীদ মনোরঞ্জন ছিলেন সেই স্রোতধারার কূল ভাঙ্গার দলে। আপোষ নয়, লক্ষ্য লাভ নয়তো মৃত্যু। তাইতো, জীবন ও মৃত্যু উভয়কেই 'পায়ের ভৃত্য' করে অকুতোভয়ে, মাথা উঁচু করে, শিরদাড়া টান্ টান্ করেই প্রশান্ত চিত্তে ফাঁসির দড়িটি ফুলের মালার মতো গলায় পরতে পেরেছিলেন মনোরঞ্জন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশ দশকে যে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয় সেই বিপ্লবী আন্দোলনে ফাঁসীর মঞ্চে সমগ্র বাংলার তৃতীয় শহীদ এই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। এর আগে ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই ফাঁসী হয় রাইটার্স বিলডিং-এর ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম যোদ্ধা বিপ্লবী বীর দীনেশ গুপ্ত-র। তার পরেই ফাঁসীর মঞ্চে দ্বিতীয় শহীদ হলেন চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। ১৯৩১ সালের ৪ ঠা আগষ্ট তাঁর ফাঁসী হয়। ফাঁসীর মঞ্চের তৃতীয় শহীদ হলেন বীর বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। ১৯৩২ সালের ২২শে আগষ্ট বরিশাল জেলে (অধুনা বাংলাদেশে) সকাল সাড়ে চারটায় শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়।

২২শে আগষ্ট, কাকভোর। ছোট্ট বরিশাল জেলা শহর। শহরবাসীরা পুলকিত বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত, জেলা প্রশাসন হতচকিত। বরিশাল শহরের প্রায় পাঁচ হাজার নাগরিক—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা—তাঁদের উদ্বেলিত অশ্রুকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতায় রূপান্তরিত করে মিছিল করে জেল গেটে হাজির হয়েছেন। হাতে তাঁদের ফুলের মালা, রক্ত গোলাপের গুচ্ছ, মুখে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শ্লোগান; এক চোখে তাদের সুতীব্র ঘৃণার আগুন, আর এক চোখে শহীদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা। শহীদের মৃত দেহকে তাঁরা ফুলে ফুলে সাজিয়ে মিছিল করে নিয়ে গিয়ে পরম শ্রদ্ধায় দাহ করবেন। মিছিলের পুরোভাগে রয়েছেন সারা বাংলার প্রখ্যাত সংগ্রামী নেতৃ মনোরমা বসু – সমগ্র বঙ্গের শ্রদ্ধেয়া মাসীমা। জেল-গেটের বাইরে অপেক্ষমান উদ্বেলিত জনসমুদ্র দেখে কর্তৃপক্ষ সৎকারের জন্য শহীদের মৃতদেহ বাইরে দিতে রাজী হয় না। জেলের মধ্যেই মনোরঞ্জনের আত্মীয়দের দ্বারা মৃতদেহ সৎকার করবার অনুমতি দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই, সেদিন সামাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বরিশাল বাসীগণ এক নতুন হাতিয়ার সংযোজন করলেন। এই হাতিয়ারের নাম 'অরন্ধন'। একদিকে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা

Scanned with OKEN Scanner

নিবেদন এবং শোক প্রকাশ, আর অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিচার ব্যবস্থা এবং স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে সে দিন বরিশাল শহরের প্রায় প্রতিটি ঘরেই অরন্ধন পালিত হয়েছিল। পরাধীন দেশের মানুষের ঘুমন্ত দেশপ্রেমকে কূল- ভাঙ্গা দেশ প্রেমিকেরা এমনি করেই জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ফাঁসীর দু'দিন আগে মনোরঞ্জনের বাবা, মা, স্ত্রী এবং ছোট দুই ভাই মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পান। মনোরঞ্জনকে দেখে তাঁর মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন, স্ত্রী নিরুপমাদেবী নিথর, নিস্পন্দ' বাবার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বিগলিত ধারা, আর ভাই দু'জনা ফ্যাল ফ্যাল করে দাদার দিকে তাকিয়ে আছে। মনোরঞ্জনের কাছে এ এক অসহনীয়, অবর্ণনীয় অবস্থা। তাঁদের সঙ্গে মনোরঞ্জনের শেষ কথা 'দুঃখ করোনা, কেঁদোনা, এ মৃত্যু দুঃখের নয়, গৌরবের।' প্রত্যয় দৃঢ়তায় মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত!

সেই দিনই মনোরঞ্জনের বাবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রে-টের সঙ্গে দেখা করে মনোরঞ্জনের মৃতদেহ সংকারের জন্য আত্মীয়দের হাতে দেওয়ার আবেদন করেন। ঐ আবেদনের জবাব পাওয়ার আগেই তাঁরা সেই রাতেই ষ্টিমারে করে দেশে চলে যান। মনোরঞ্জনের বাবা ছয়জন আত্মীয়ের নাম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিয়ে যান। আত্মীয়দের হাতে শহীদের মৃতদেহ কর্তৃপক্ষ দিতে রাজী হয় না। কারণ, বিপ্লবীদের মৃতদেহকেও শাসকশ্রেণী ভয় ও আতঙ্কের চোখেই দেখে। শহীদদের মৃতদেহ তখন আর একটি 'শব' মাত্র নয়; কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক। এই মৃত্যুর পথের মধ্যেই যে শৃঙ্খলিতদের বাঁচবার চাবি কাঠি রয়েছে। অবশেষে, জেলের মধ্যে পুলিশ প্রহরায় শহীদের সংকারের পরে যখন ছয়জন যুবক জেল গেট থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন মিথ্যা পরিচয় প্রদানের অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। একজন জেলগেট পেরিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য, পরে তিনিও গ্রেপ্তার হন। না, এই ছয়জন যুবকের কেউ রক্তের সম্পর্কে মনোরঞ্জনের আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা ছিলেন মনোরঞ্জনের পরমাত্মীয়, সুহৃদ, একই পথের পথিক। জেল গেটে যখন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়, তখন জেলগেট শহীদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ফুলের মালায় মালায় একাকার। হ্যাঁ, ফাঁসীর দড়ি এমনি করেই ফুলের মালা হয়ে উঠেছিল।

কে এই মনোরঞ্জন? কি তাঁর পরিচয়?

জীবন পরিচয়

আজ থেকে চুয়াত্তর বছর আগে ১৯০৯ সালের ২১শে জুলাই এক যজন-যাজন রত গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে মনোরঞ্জনের জন্ম হয়। ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলা দেশে) মাদারীপুর মহকুমাস্থ ইদিলপুর পরগণার এড়িকাঠি নামক এক গণ্ডগ্রামে এই ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করতেন। পিতা প্রয়াত

Scanned with OKEN Scanner

কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ছিলেন একজন অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কারী ও নিরাভিমানী, সদাচারী ব্রাহ্মণ। স্বভাবতই, এই পরিবার "ম্লেচ্ছ" ইংরেজী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মনোরঞ্জনের বাড়ি সংলগ্ন আর যে কয়খানি বাড়ি ছিল তাঁরাও মনোরঞ্জনদের মতোই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ছুঁৎমার্গ এবং গোঁড়া রক্ষণশীলতার জন্য এই ব্রাহ্মণ পরিবার কয়টি ছিল গ্রামের তরুণদের মুখোরচক আলোচনার বিষয়বস্তু। অ-ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই পল্লীটির সামাজিক মেলা-মেশা ছিল না। বাল্যকালে বেশ বয়স পর্যন্ত তাই মনোরঞ্জনকে সন্ধ্যা পূজা এবং সংস্কৃত পাঠ নিয়েই সঙ্গীহীন হয়ে কাটাতে হয়েছে। মাঝে মাঝে বাবার সঙ্গে শিষ্য বাড়ি যাওয়াটাই ছিল তাঁর নিস্তরঙ্গ জীবনের একমাত্র তরঙ্গ।

কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ, একঘেঁয়ে জীবনেও একদিন উথাল পাথাল ঢেউ উঠলো। সুদীর্ঘকাল পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন, অথচ পরিবারের একান্ত আপনজন, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, সুদূর আসামে রেল কোম্পানীর চাকুরিয়া, অকৃতদার কাকা হঠাৎই দেশে এলেন। তাঁর স্থান অবশ্য, বৈঠকখানা ঘরেই ছিল, অন্দরমহলে নয়, কিন্তু উদারমনা কাকা তাতে কিছু মনে করেননি। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান মনোরঞ্জনকে লেখাপড়া করতে হবে ইংরেজী স্কুলেই। কাকা মনোরঞ্জনকে তাঁর সঙ্গে আসামে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু মনোরঞ্জনের বাবা ও মা রাজী হলেন না। ইংরেজী শিক্ষায় বাবা মা-র আপত্তি, সংস্কার, আর্থিক অনটনের অজুহাত কোন কিছুই এই ব্যক্তিত্বশালী, অমায়িক, যুক্তিবাদী লোকটির কাছে দাঁড়াতে পারলো না। অবশেষে, দেশে থেকেই মনোরঞ্জনকে ইংরেজী স্কুলে পড়ানো হবে বলে স্থির হয়। মনোরঞ্জন স্থানীয় কনেশ্বর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। স্বাস্থ্যবান, বেঁটে খাটো, উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল মনোরঞ্জন ছুঁৎমার্গ ও রক্ষণশীলতার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এক কদম এগিয়ে এলেন, নিস্তরঙ্গ জীবনে তরঙ্গাভিঘাতের একটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হলো।

মনোরঞ্জন যে গ্রামের মানুষ সেই এড়িকাঠি গ্রামখানা গণ্ডগ্রাম হলেও কিন্তু রাজনৈতিক ঐতিহ্য-মণ্ডিত। এই গ্রামেরই পাঁচজন যুবক চাঁদপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করবার সময়ে প্রথম মাহযুদ্ধের সময়ে ভারতরক্ষা আইনে ইংরেজের জেলে বছরের পর বছর বন্দী ছিলেন। তাঁদেরই গড়া 'এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরী' এই অঞ্চলের বিশ ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে ছিল এক নামী যুব সংগঠন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' ছাড়াও 'মডার্ণ রিভিয়ু' 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রপত্রিকাও এই লাইব্রেরীতে নিয়মিতভাবে রাখা হতো। কিশোর এবং তরুণদের উপযুক্ত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও, আরো যে সব পত্রিকা রাখা হতো 'বেনু' তার মধ্যে ছিল উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। এই লাইব্রেরীর জিমনাষ্টিক বিভাগ, আবৃত্তি ও বিতর্ক বিভাগ ছাড়াও ছিল একটি সেবা (Nursing) বিভাগ এবং একটি আগুন নেভানো (Fire fighting) বিভাগ। এই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরী। স্কুলে ভর্তি হওয়ার

Scanned with OKEN Scanner

কিছুদিন পরেই মনোরঞ্জন নিয়মিতভাবে লাইব্রেরীতে যাতায়াত শুরু করেন। মনোরঞ্জন যে পাড়ায় বাস করতেন, বর্ষাকালে তা হয়ে যেতো একটা দ্বীপের মতো। চারদিকে জল আর মাঝখানে এই পল্লীটি। এই অবস্থা সত্বেও মনোরঞ্জন কিন্তু প্রতিদিনই লাইব্রেরীতে আসতেন। একখানা ছোট নৌকা (কোষা) করে কিংবা কোনো কোনো দিন একখানা গামছা পরে তিনি লাইব্রেরীতে আসতেন। কোনো বাধাই তাঁর লাইব্রেরীতে আসা রুখতে পারতো না। নিরহঙ্কার, নিরভিমান, সদা হাস্যময় এই কিশোর ধীরে ধীরে সবার অলক্ষেই সকলের হৃদয় জয় করেন। উদাত্ত কণ্ঠে, সমস্ত হৃদয়াবেগ দিয়ে যখন তিনি আবৃত্তি করতেন 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা/ আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা' বা 'এ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির / মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর, তখন মনে হতো মনোরঞ্জন যেন স্বতোৎসারিতভাবে নিজের কথাই বলছেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন, এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরী প্রতি বছরেই 'শক্তিপূজা'র একটি অনুষ্ঠান করতো। এই শক্তি পূজাটা ছিল আড়াল। এই উপলক্ষেই লাঠি ও ছোরা খেলা, পোলজাম্প, হাইজাম্প এবং রণ-পা ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হতো এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিপ্লববাদ প্রচারের উপযোগী আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, বিতর্ক, গান ইত্যাদির অনুষ্ঠান হতো। এই অনুষ্ঠানেই মনোরঞ্জন আবৃত্তি করতেন এবং গান গাইতেন।

আগেই বলা হয়েছে, লাইব্রেরীর একটি সেবা বিভাগ ছিল। গ্রামের কারও অসুখ বিসুখ হলে রাত জেগে সেবা করা, থার্মোমিটার, বেড্‌প্যান, অয়েল ক্লথ এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ছিল এই সেবা বিভাগের কাজ। মনোরঞ্জনও ছিলেন এই সেবা বিভাগের একজন উৎসাহী কর্মী। একবার একটি নাপিত ছেলের টাইফয়েড, মনোরঞ্জন চাইলেন তাঁকেও রাত জেগে ছেলেটির শুশ্রূষা করতে দেওয়া হোক্। নাপিত বাড়ির ছেলেকে শুশ্রূষা! বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন তো রেগে কাঁই। ছিঃ ছিঃ করে উঠলেন তাঁরা। আর ওদিকে নাপিত বউও কিছুতেই ব্রাহ্মণের সেবা নিয়ে তার ছেলের জন্য পাপ কুড়োতে রাজী নয়। কিন্তু মনোরঞ্জন নাছোড়বান্দা। যা কিছু সেকেলে, যা কিছু অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন তার অচলায়তন ভাঙ্গার সুদৃঢ় পণ নেওয়ার মধ্য দিয়েই জীবনকে ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই ভাবধারা তখনকার অন্যান্য যুবকদের মতো মনোরঞ্জনকেও প্রভাবান্বিত করেছিল।

আর একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনার উদাহরণ। মনোরঞ্জন তখন লাইব্রেরী কর্মীদের সামনের সারিতে এসেছেন। লাইব্রেরীর জন্য বড়ো টিনের ঘর প্রয়োজন। তার একদিকে থাকবে লাইব্রেরী আর মাঝখানে টিনের দেয়াল দিয়ে আর দিকে থাকবে ফ্রি রিডিং রুম এবং বিতর্ক সভার ব্যবস্থা। পুজার ছুটির সময়েই লাইব্রেরীর বাৎসরিক সভা হয়, কারণ, ঐ সময়েই কোলকাতা এবং অন্যান্য স্থানের চাকুরি জীবী এবং কলেজের পড়ুয়ারা দেশে আসেন। তারাই লাইব্রেরীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাৎসরিক সভায় লাইব্রেরী ঘর বড়ো করে টিনের চালা দেওয়ার প্রস্তাবটিকে প্রবীন এবং প্রৌঢ়রা হেসেই উড়িয়ে

দিলেন। অন্যান্য যুবকেরাও প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহের কোনো বাস্তবপথ দেখাতে পারলেননা। শুধু মাত্র মাসিক চাঁদা এবং এককালীন দান থেকে অন্যান্য খরচা মিটিয়ে লাইব্রেরী ঘরের প্রস্তাবিত সংস্কার সাধন অসম্ভব। মনোরঞ্জন এগিয়ে এলেন। ইতি-মধ্যেই তিনি কয়েকজনের সঙ্গে আলাপআলোচনা করে নিয়েছেন। তিনি বললেন, ঘাট্‌তি টাকা সংগ্রহের দায়ীত্ব তিনি নিতে প্রস্তুত। মনোরঞ্জন বলেন, 'আপনারা আপনাদের চাঁদা বাদে কোলকাতা থেকে গোটা কয়েক দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা ফ্রি রিডিং রুমের জন্য নিয়মিত ভাবে পাঠানোর দায়ীত্ব নিন। কি ভাবে মনোরঞ্জন টাকা সংগ্রহ করবেন তা শুনবার পরে লাইব্রেরী ঘর সংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বুঝিবা এই একগুয়ে ছেলেটাকে জব্দ করবার জন্যই সে বছরের জন্য মনোরঞ্জনকে লাইব্রেরীর সম্পাদক করা হয়। মনোরঞ্জন তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র।

মনোরঞ্জন কি পেরেছিলেন তাঁর এই ক্ষুদ্র স্বপ্ন-টুকু স্বার্থক করতে? টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে মনোরঞ্জন বাৎসরিক সভায় যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ছিল যেমনই অভিনব, তেমনই বিদ্যুৎসঞ্চারী। গ্রামের অনেকের বাড়িতেই রান্না করবার জন্য গাছ কেটে লাকড়ি জ্বালানী হিসাবে ব্যাবহার করতে হয়। তা ছাড়া পুকুরের কচুরি পানাও পরিস্কার করাতে হয়। মাটি কেটে রাস্তা তৈরী করাতে হয়। মজুরীর বিনিময়ে দিন মজুরেরাই এ সব কাজ করে। একমাত্র জমিদার, তালুকদারেরাই এ সব কাজ তাঁদের ভিটে বাড়ির প্রজাদের দিয়ে একবেলার খোরাকীর বিনিময়ে করাতো। গ্রামের সমস্ত কিশোরদের জড়ো করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব কাজ দিন মজুরের বদলে তাদের দিয়ে করানোর আবেদন রাখলেন মনোরঞ্জন। কাজও হলো। মহা উৎসাহে মনোরঞ্জনের নেতৃত্বে গাছ কাটাই, কাঠ চেরাই, পুকুরের কচুরি পানা পরিষ্কার এবং মাটি কাটার কাজে গ্রামের কিশোর ও তরুণেরা লেগে গেলো। শুধু নিজেদের গ্রামেই নয়, পার্শ্ববতী গ্রামগুলি থেকেও আহ্বান এলো। স্বভাবতই দিন মজুরেরা যে মজুরী পেতো তার চাইতে বেশী মজুরীই পাওয়া গেলো। এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরীর ছেলেদের এ সব কাজ দেখে কনেশ্বর ইউনিয়ন বোর্ড তার অধীনস্থ সমস্ত খালগুলির কচুরি পানা পরিষ্কারের কাজ এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরীকে দেয়। ফলে বেশ মোটা টাকাই হাতে এলো। এই টাকা দিয়ে গণ্ডগ্রামের মধ্যে যে লাইব্রেরী গড়ে তোলা হলো, যে সব বিভিন্ন বিষয়ের বই কেনা হলো তা তখনকার দিনে একটা গর্বের বস্তুই ছিল। বিভিন্ন বিষয়ের বই কেনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে।

কোলকাতায় পড়ুয়া যুবকেরা হয়তো রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিকদের নাম শুনেছিল। তারা 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' প্রকাশিত 'বলশেভিকবাদ' নামে একখানা বিশাল মোটা বই কিনে লাইব্রেরীর জন্য পাঠিয়ে দেয়। এড়িকাঠি গ্রামের ছেলেরা এই প্রথম লেনিন, বলশেভিকবাদ, ইত্যাদি শব্দগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়। সময়টা বোধহয় ১৯২৮ সাল। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত এই 'বলশেভিক-বাদ' বইখানায় লেনিন এবং বলশেভিকদের নরমাংস-ভোজী (Cannibals) ব'লে এবং জার্মানীর গুপ্তচর ব'লে দেখানো হয়েছে। এই বইখানা ছাড়া কমিউ-

নিজম সংক্রান্ত আর অন্য কোনো বই লাইব্রেরীতে ছিল না, অথচ ফরাসী বিপ্লব, ইষ্টার বিদ্রোহ ও সিন-ফিন আন্দোলন সংক্রান্ত, ম্যাটসিনি, গ্যারিবলডির জীবনী ইত্যাদি অনেক বই-ই ছিল। এমন কি রাশিয়ার নিহিলিষ্ট আন্দোলন ও ক্রপট্কিনের বইও ছিল।

যাইহোক, মনোরঞ্জনের সম্বন্ধে আর একটি উদাহরণ। এড়িকাঠি গ্রাম থেকে কালুরগাঁ গ্রাম প্রায় ৪ কিলোমিটার। সেই গ্রামে মহামারীরূপে কলেরার আবির্ভাব হয়েছে। সেবাব্রতী, পরোপকারী আত্মত্যাগী, নিরভিমানী হিসাবে মনোরঞ্জন ও তাঁর দলের নাম অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কনেশ্বর হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাষ্টার প্রয়াত সুরেন বসু মশাই (ইনি যুগান্তর দলের ছিলেন) মনোরঞ্জনকে ডেকে কালুরগাঁ গিয়ে সেখানকার সেবা শুশ্রূষার দায়ীত্ব নিতে বলেন। এক মুহূর্তের দ্বিধা নেই। হাতের মুঠোয় তাজা জীবনকে নিয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে মনোরঞ্জন তাঁর দলবল নিয়ে ঝাঁপ দিলেন। কালুরগাঁ গ্রামের সে এক অবর্ণনীয়, বমনোদ্রেককারী, ন্যককারজনক দৃশ্য। একই বাড়িতে এমন কি একই ঘরে চার পাঁচজন কলেরায় আক্রান্ত। মল ও বমি পরিষ্কার করা এবং শবদাহ করাটাই ছিল সেবার প্রথম ও শেষ কাজ। একই চিতায় একই সঙ্গে কয়েক জনকে চাপানো হয়েছে। এই নারকীয় দৃশ্যের মধ্যে, এই জীবন ও মৃত্যুর করাল রূপের মধ্যেও মনোরঞ্জনের কর্তব্য নিষ্ঠার একাগ্রতা আর পরাধীনতার গ্লানির প্রতি সুতীব্র ঘৃণার এবং মানুষের প্রতি অকৃত্রিম দরদের পরিচয় পাওয়া যায়। মনোরঞ্জন তখন দাঁতে দাঁত রেখে বলেছেন, যুদ্ধে মৃত্যু আছে কিন্তু রোগে এই মৃত্যুর মিছিল স্বাধীন দেশে নেই। পরাধীনতাই আমাদের অভিশাপ ও কলঙ্ক। দেশকে স্বাধীন করবার অনমনীয় সংকল্প এ সব ঘটনার মধ্য থেকে মনোরঞ্জনের মধ্যে ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে।

সময়টা ১৯২৪ এর ডিসেম্বর। মনোরঞ্জনের বয়স তখন মাত্র পনেরো বছর। বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। হঠাৎ, মনোরঞ্জনের কোনো পাত্তা নেই। মনোরঞ্জন নিখোঁজ। গ্রামের আরও দু'টি কিশোরও নিখোঁজ।.. ব্যাপার আর কিছুই নয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে ফরিদপুর শহরে কংগ্রেসের যে প্রাদেশিক কনফারেন্স হচ্ছিল সেখানেই মনোরঞ্জন তাঁর দুই সঙ্গীসহ ভলান্টিয়ার হয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলামও এই কনফারেন্সে এসেছিলেন। মনোরঞ্জনের গানের গলা ছিল যেমনি উদাত্ত তেমনি মিষ্টি। স্বভাবতই, এই কিশোরের দিকে কাজী নজরুলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কনফারেন্সের কদিন মনোরঞ্জন নজরুলের কাছে কাছেই থাকেন। নজরুলের সব গানের মধ্যে মনোরঞ্জনের সব চাইতে প্রিয় গান ছিল ঃ

> বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ,
> নব যুগ ঐ এলো ঐ
> এলো ঐ রক্ত যুগান্তর রে।'

আর সব চাইতে প্রিয় আবৃত্তি ছিল ঃ

'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়'

এই কনফারেন্সের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ প্রয়োজন। এড়িকাঠি গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম প্রিয় কাঠির প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনের বন্দী যুগান্তর দলের প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর (বর্তমানে প্রয়াত) লেখা 'চীনের ছাত্র সমাজ' নামে বইখানা

Scanned with OKEN Scanner

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত হয়। কনফারেন্সে এই বইখানার অনেক কপি গোপনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মনোরঞ্জন এই বইখানা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে—অনেকগুলি কপি বিক্রয় করেন।

১৯২৬ সালে মনোরঞ্জন প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। লেখাপড়ায় তিনি শৈশব থেকেই বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ম্যাট্রিক পাশ করবার পরে মনোরঞ্জন কাকার কাছে আসাম চলে যান, এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সেখানে টেলিগ্রাফী পাশ করেন এবং ঢাকায় রেল টেলিগ্রাফ অফিসে চাকুরি পান। আসাম থাকা কালীনই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন এবং তার পর থেকেই মাঝে মাঝেই ম্যালেরিয়ায় ভুগতে থাকেন। ঢাকায় চাকুরি কালীন 'সাং, মৈং, সাং, (সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা') নামে একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠির সঙ্গে মনোরঞ্জরের পরিচয় ঘটে। এই সংগঠনেই মনোরঞ্জন রুশ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, লেনিন, কমিউনিজম ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক নতুন, নতুন কথা জানতে পারেন। কিন্তু এগুলো তাঁর কাছে নিছক শব্দ মাত্রই ছিল। ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে কমিউনিজমের কথা কিছুটা প্রচার হলেও ১৯২৭-২৮ সালে তা ছিল একেবারেই অপরিচিত। সাং মৈং সাং ছিল একটি টেরো-কমিউনিষ্ট সংগঠন, বীর বিপ্লবী ভগত সিং-এর হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপ্লাবলিকান আর্মির ভাবধারায় গঠিত। বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। ১৯২৪ সালে জেলে গিয়ে যে সব বিপ্লবী ২৭-২৮ সালে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি একটু আধটু কমিউনিজম সম্বন্ধে পড়াশুনা করে এই টেরো-কমিউনিজমের কথা ভাবতেন, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করবার কথাও বলতেন। এরূপ একটি সংগঠনই ছিল ঢাকার সাং মৈং সাং। এই সংগঠন মনোরঞ্জনের উপরে যদিও কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার ক্ষেত্রকে নিঃসন্দেহে খানিকটা প্রসারিত করেছিল। নিছক সেবাব্রতই স্বাধীনতা অর্জনের পথ কিনা, আবার মানুষের দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থকতা কেমন করে হতে পারে এ সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল—কারণ, সাং মৈং সাং মনোরঞ্জনের সেবাব্রতকে রামকৃষ্ণ মিশন-সুলভ কাজ বলে সমালোচনা করেছে।

যাই হোক, চাকুরি কিন্তু তাঁর অনির্বাণ দেশ প্রেমের মধ্যে এতটুকুও খাঁদ মেশাতে পারেনি। চাকুরি কালীনই মাঝে মাঝে হাড় কাঁপিয়ে জ্বর আসতো, দারুন শীত আর ১০৩/৪ ডিগ্রী জ্বর। তিনি ছুটি নিয়ে দেশে আসেন। এই সময়েই বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লোক রাতের অন্ধকারে মনোরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বাজেয়াপ্ত বই—বিপ্লবী কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন সম্বন্ধে বই পড়তে দেন। এরই মধ্যে কংগ্রেসের ডাক আসে সাইমন কমিশন বয়কটের জন্য। মনোরঞ্জনের মধ্যে যেন একটা বিদ্যুতের দাবদাহ। তারই সফল নেতৃত্বে কনেশ্বর হাই স্কুলে স্ট্রাইক হয়। 'সাইমন ফিরে যাও' স্লোগানে মুখরিত একটা মিছিল মনোরঞ্জনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রথম রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রথম মহড়া মনোরঞ্জনের নেতৃত্বে সাফল্য মণ্ডিত হয়। মনোরঞ্জন আর শুধু সেবাব্রতীই নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামের সংগঠকও। অঞ্চলে মনোরঞ্জন 'স্বদেশী' বলে পরিচিতি লাভ করেন।

Scanned with OKEN Scanner

পাশ করা ছেলে, রেলের চাকুরিয়া, অথচ ঘর-মুখো টান নেই' বরঞ্চ 'স্বদেশী' হয়ে যাচ্ছে। এর একমাত্র মোক্ষম প্রতিষেধক হচ্ছে একটি রাঙ্গা টুকটুকে বউ। অতএব ছেলেকে বিয়ে দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে ললাটে বন্ধন গ্রন্থি পড়িয়ে দাও, সমস্ত দুর্ভাবনার, দুশ্চিন্তার অবসান হোক। এই ছিল তখনকার বাবা মায়ের চিন্তাধারা। তাই, মনোরনঞ্জকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু বিয়েতে মনোরঞ্জনের ঘোর আপত্তি। তখনকার দিনে বিবাহিত জীবনের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করা খুবই কঠিন ছিল। বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ বাঘাযতীন এবং আরও দু-চার-জন অবশ্য বিবাহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম। মনোরঞ্জনের আপত্তি সত্বেও বিয়ের দিনও ঠিক করা হয়ে গেছে। মনোরঞ্জন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ক'দিন আর পালিয়ে থাকবেন? ১০৩/৪ ডিগ্রী জ্বর নিয়ে আচ্ছন্নের মতো অবস্থায় তিনি বাড়ি ফিরলেন। এই ভীষণ জ্বরের মধ্যেই ষ্টিমার আর নৌকায় করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার একটি গ্রামে। সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় নিরুপমা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়, মন্ত্র পড়েন পুরুত ঠাকুর। মনোরঞ্জনের মন্ত্র পড়বার মতোও অবস্থা ছিলনা। মনোরঞ্জন যতোদিন বাইরে ছিলেন ততোদিন এই বিয়েকে তিনি স্বীকার করেন নি এবং এমন কি এক রাত্রির জন্যও স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করেন নি। অবশ্য, জেলে গিয়ে, বিশেষ করে, ফাঁসীর হুকুমের পরে মনোরঞ্জন খুব সম্ভবত তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নতুন করে ভেবেছিলেন। জেল থেকে তাঁর স্ত্রী নিরূপমা দেবীর কাছে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন তার একখানা চিঠিতে মনোরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দেব' কবিতটি থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছিলেন ঃ

'এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।'

দল নির্বাচন

১৯২৯ সালে ফরিদপুর জেলার গোহালায় জেলা যুব কনফারেন্স। মনোরঞ্জন ঠিক করেন তাঁর দল বল নিয়ে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে কর্মপন্থা ঠিক করবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর আর দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে মনোরঞ্জন গোহালার পথে মাদারীপুর শহরে যান। মাদারীপুর! বুড়িবালামের চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জনের মাদারীপুর! পূর্ণচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্র মোহন সাহা, পঞ্চানন চক্রবর্তীর মাদারীপুর। বিপ্লবীদের তীর্থক্ষেত্র। এখানে বিপ্লবী নেতা পূর্ণচন্দ্র দাস-এর সঙ্গে দীর্ঘ সময় মনোরঞ্জনের আলাপ আলোচনা হয়, গোহালা কনফারেন্সে যাওয়া বাতিল

Scanned with OKEN Scanner

হয়। এই আলাপ আলোচনার পরেই মনোরঞ্জন তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পূর্ণচন্দ্র দাসের দলে যোগ দেন। মনোরঞ্জনের জীবনে এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়। তিনি চাকুরিতে আর যোগদান করেননা।

এই দলে যোগদান করলেও গোড়া থেকেই সেবাব্রত মূলক কাজের প্রতি মমোরঞ্জনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট, বিপদ, বিপর্যয় মনোরঞ্জকে চঞ্চল করে তুলতো তাই বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েও তাঁর একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল। গোপন কাজের চাইতে প্রকাশ্য এবং জনসেবা মূলক কাজের প্রতিই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। এই মানসিক দ্বন্দ্বের সময়েই ভারতের বুকে দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। একটি ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন তার দ্বিতীয়টি কংগ্রেসের আইন অমান্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও। এছারাসনী আইনে এড়িকাঠি বয়েজ লাইব্রেরী বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং পুলিশ লাইব্রেরী ঘরকে তালাবন্ধ করে। পরবর্তী কালে এই গ্রামে পুলিশ ক্যাম্প বসে এবং সন্দেহভাজন তরুণদের উপরে অকথ্য নির্ধাতন ও নিপীড়ন চলে, বহু যুবক অন্তরীনাবদ্ধ হয়। প্রকাশ্য কাজ কর্ম গুটিয়ে দলের নির্দেশে গোপন কার্য কলাপ সুরু হয়। দলের অনুমতি নিয়েই মনোরঞ্জন কংগ্রেসের আইন অমান্য এবং লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রেপ্তার এড়িয়ে পালং এবং আঙ্গারিয়ার সত্যাগ্রহ শিবির পরিচালনা করতে থাকেন।

দলের দুটি বিভাগে ছিল, একটি প্রকাশ্য ও অপরটি গোপন। প্রকাশ্য বিভাগ প্রধাণত গোপন বিভাগের উপযুক্ত কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্র ছিল। মনোরঞ্জন প্রকাশ্য বিভাগেই কাজ করছিলেন। এণ্ডারসনি আইনের প্রথম আঘাতের পরেই দলের গোপন বিভাগের নেতৃত্বে আসেন শ্রীঅনুকূল চ্যাটার্জি (ইন্দুদা)। বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাস্থ্যবান, অসম্ভব চটপটে এবং মৃদু হাস্যমুখ এই যুবক মনোরঞ্জনের সংগঠন পরিচালনার দক্ষতাকে অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রধাণত এই যুবকের প্রভাবেই মনোরঞ্জন গোপণ কাজে বেশী করে লিপ্ত হতে থাকেন। গোপন কাজের, বিশেষত, টেকনিক্যাল কাজের, কোনো ইতিহাস থাকেনা, তাই ব্যক্তি মনোরঞ্জনের পরিচিতির ছেদ ঘটে তখন থেকেই।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও পরবর্তী কার্যকলাপের আঘাতে একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে, অপরদিকে তেমনি বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনুরূপ আঘাত হানবার প্রেরণা জোগায়। তখন যাঁরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করে কাজ চালাচ্ছিলেন, তাঁদের কাছে প্রধাণ সমস্যা ছিল একই দলভুক্ত বিভিন্ন স্থানের কর্মীদের সঙ্গে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন যোগসূত্রগুলি পুণঃপ্রতিষ্ঠা করা। গোপন কাজের এই দিকটিই সুকঠিন, কিন্তু কাজ চালিয়ে যেতে হলে একান্ত জরুরী। এই কাজটির সাফল্যের উপরেই নির্ভর করে সংগঠনকে মজবুত করা, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা, ষড়যন্ত্রমূলক কাজের নিখুঁত পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। কাজটা কঠিন হলেও এই যোগাযোগের কাজটি ইন্দুদার নেতৃত্বে সংগঠন দক্ষতার সঙ্গেই সম্পাদন করতে পেরেছিল। পূর্ণদাসের দলের একটি গ্রুপ ছিল বার্মায়। ঢাকা, বরিশাল, কলকাতা ইত্যাদি স্থানের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগগুলি পুণঃপ্রতিষ্ঠা আপেক্ষিপভাবে সহজ হলেও বার্মার সঙ্গে

যোগাযোগ পুনঃস্থাপণ বেশ সময় নেয়। বার্মার গ্রুপও দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য একজনকে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। অবশেষে বার্মার গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তাঁদের সঙ্গে আলোচনার পরে এক ব্যাপক কার্যকলাপের (action) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অস্ত্র-শস্ত্রের, রিভলবার ও পিস্তলের। একটা, তু'টো নয়, অসংখ্য, অনেক। সিদ্ধান্ত হয়, বার্মা গ্রুপ কয়েকজনকে জাহাজের খালাসী করে বাইরের সংগে যোগাযোগ করে অস্ত্রাদি কেনবার বন্দোবস্ত করবে। এর জন্য ওরিসার পুরীতেও একটি ঘাঁটি করা হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বার্মা গ্রুপ থেকে খবরএলো, সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, টাকা পেলেই ইচ্ছে মতো অস্ত্রশস্ত্র কিনে আনা যায়। ইতিমধ্যে কিছু অস্ত্রও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু টাকা কই ?

টাকার সন্ধানে

অস্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহের তাগিদেই বিপ্লবীদের ডাকাতি করতে হয়। কিন্তু ত্রিশ দশকের ডাকাতি 'বিধবার ঘটি' নয়—সরকারী টাকা লুণ্ঠন। আর তারই অংগ হিসেবে চরমুগুরিয়া পোষ্ট অফিস আক্রমণের সিদ্ধান্ত হয়। কলকাতায় সুলভ, তড়িতগতি যানবাহনের সুযোগ নিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে একটি এই ধরণের ডাকাতিতে আশাতীত সাফল্য অর্জনে প্রকাশ্য দিবালোকে চড়মুগুরিয়া পোষ্ট অফিস আক্রমণে উৎসাহ জোগায়। প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ বন্দরে যানবাহনের সুবিধা বিহীন অবস্থায় পোষ্ট অফিসের মধ্যে গিয়ে সরকারী অর্থ লুঠ করা তখনকার দিনে অসীম মনোবল এবং সাহসিকতার পরিচয় দেয় সত্যি, কিন্তু যানবাহনের অভাবের দিকটি তাচ্ছিল্য করায়ই বিপদ ঘটে। এই সরকারী অর্থ লুণ্ঠন নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু তার পরেই মনোরঞ্জন এবং তাঁর সঙ্গীরা বহুলোকের দ্বারা পশ্চাদধাবিত হন। বিশাল উন্মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালানো প্রায় এক অসম্ভব ব্যাপার। রিভালবার ও পিস্তলের গুলি যতোক্ষণ ছিল, ততোক্ষণ পর্যন্ত পশ্চাদধাবিত লোকদের একটা নিরাপদ দূরত্বে তাঁরা সরিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু এবার আর শুধু পেছনের দিক থেকে নয়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনের দিক থেকেও পশ্চাদধাবিত লোকের হাক্-ডাক এবং গুলির শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পিল পিল করে লোক এগিয়ে এলো। পরিবেষ্ঠণী ভেদ করে মনোরঞ্জন পালাতে পেরেছিলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত পালাতে পারতেন কিনা তা বলা কঠিন। কিন্তু তা তখন নিশ্চয়ই বিবেচনার বিষয় ছিল না। এখানেও মনোরঞ্জনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। অনেক

Scanned with OKEN Scanner

দুর গিয়ে, পেছন ফিরে যখন মনোরঞ্জন দেখতে পান যে তাঁর একজন সংগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেছেন এবং লোকজন তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, তখন মনোরঞ্জনের কাছে 'য পলায়তি, স জীবতি' এই সংকীর্ণ আত্মস্বার্থ রক্ষার দুর্নীতির চাইতে, তুচ্ছ জীবনের চাইতে, কুলীশ কঠোর কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনি। সংগীকে ঘেরাও থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য মনোরঞ্জন ফিরে এলেন। লোকজন মনোরঞ্জনকেও চারদিক থেকে তক্ষুনি ঘিরে ফেলে। পালাবার আর কোন পথ নেই, রিভলবারেও নেই বুলেট। মুহূর্তের দ্বিধা না করে কোমর থেকে শানিত ছোরা বের করে যে বিশ্বাসঘাতক তাঁকে জাপটে ধরেছিল তাকে আঘাত করে ধরাশায়ী করে পালাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ধরা তাঁকে পড়তেই হয়। আর বাকী কয়জন সংগীও ধরা পড়েন। মনোরঞ্জনের নেতৃত্বে আর যে চারজন বিপ্লবী এই ডাকাতিতে ছিলেন, তাঁদের নাম, সুরেন্দ্র মোহন কর, রামচন্দ্র দাস, সন্তোষ দত্ত এবং সুবল চন্দ্র রায় কর্মকার। ১৯৩২ সালের ১৪ই মার্চ বেলা ৩টার সময়ে এই ডাকাতি হয়। বিচারে মনোরঞ্জনের ফাঁসীর হুকুম হয়। আর সুরেন্দ্র মোহন করের যাবজ্জীবন দীপান্তর এবং অপর তিনজনের বয়সের বিবেচনা করে হয় সাতবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড। মনোরঞ্জনের ফাঁসীর রায়ের পরে হাইকোর্টে আপীল করে জীবন রক্ষার চেষ্টা করা হয়। বিচার যখন চলছিল, তখন দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই জেলে বা আত্মগোপন করে রয়েছেন। বিচারের ব্যাপারে তদ্বির তদারকের জন্য দক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন। অথচ, যে ব্যক্তিই এই তদ্বির তদারক করবেন অবধারিত ভাবে তাঁর নামও পুলিশের কালো খাতায় উঠবে। এ সব অন্তরায় স্বত্বেও দলের ঘনিষ্ঠ সমর্থক কলকাতা কর্পোরেশন স্কুলের শিক্ষক, এড়িকাঠি গ্রামেরই যুবক শ্রীবীরেন্দ্র মোহম গুহ এগিয়ে এলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় বি, সি, চ্যাটার্জি, এন, আর, দাশগুপ্ত প্রমুখ বাঘা বাঘা ব্যারিষ্টারদের নিয়োগ সম্ভব হয়। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ফাঁসীর হুকুমের পরে মনোরঞ্জনকে ফরিদপুর জেল থেকে বরিশাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। বড়োলাটের কাছে জীবন ভিক্ষার আবেদনে মনোরঞ্জন দস্তখত করতে রাজী হননা।

উপসংহার

অসংখ্য শহীদের রক্তে লব্ধ আমাদের এই স্বাধীনতা, তার জন্য সকল শহীদের কাছে দেশবাসী চিরঋণী। তাইতো, এই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এবং শহীদের স্মৃতিকে অমর করে

Scanned with OKEN Scanner

রাখবার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ লেক গার্ডেন্স্ এলাকায় একটি রাস্তার নামাকরণ করেছেন 'শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের নামে। এর জন্য মনোরঞ্জন স্মৃতি সংঘ এবং শহীদের অসংখ্য অনুরাগীরা খুবই গর্বিত। কলকাতা করর্পোরেশনকে ধন্যবাদ।

যে কাজ মনোরঞ্জন করেছেন, সে কাজের জন্য তিনি আদৌ অনুতপ্ত হননি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে জেলে বসে, বিশেষ করে, ফাঁসীর হুকুমের পরে, জীবনকে তিনি অবশ্যই সমালোচনা করেছেন, আত্মানুসন্ধান করেছেন। সাধারণ মানুষকে সেবা করা আর সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গোপন এবং ষড়ান্ত্রমূলক বিপ্লবী পথের যে দ্বন্দ্ব, যে সংঘাত মনোরঞ্জনকে বিদীর্ণ করতো, সে দ্বন্দ্বের সমাধান হয়তো মনোরঞ্জন খুঁজে পাননি। কিন্তু প্রশ্নটি তাঁর দৃষ্টি এবং চিন্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনোরঞ্জন হয়তো তখনকার আরও বহু বিপ্লবীর মতো সে দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ খুঁজেপাননি, কিন্তু আমরা, তাঁর সাথী এবং উত্তর সুরীরা সে পথ খুঁজে পেয়েছি। জনসাধারণের দৈনন্দিন দুর্দশার ভাগ অবশ্যই আমাদের নিতে হবে, তাঁদের পাশে এসে অবশ্যই আমাদের দাঁড়াতে হবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দৈনন্দিন এই দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, সংস্কারের কাজ করতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে যেমন নিছক সেবাব্রতী হয়ে নয়, আবার তেমনি নিছক ষড়যন্ত্রকারী হয়েও নয়। যদিও সেবাব্রত একটা অপরিহার্য কাজ, কিন্তু সে কাজ করতে হবে সংস্কারবাদী হয়ে নয়—বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মী হয়ে, গণ সংগঠক হয়ে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, খরা, অনাহার, দারিদ্র্য, বেকারী প্রতিটি ঘটনায় জনগণের সেবায় যেমন অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে, জনগণকেও উদ্বুদ্ধ এবং সংগঠিত করতে হবে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মূল লক্ষ্যকে চোখের সামনে অম্লান রেখে প্রতিটি ঘটনার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আশু সমস্যার সঙ্গে চূড়ান্ত লক্ষ্যের জীবন্ত যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লবী মনোরঞ্জনের অবচেতন মন ঐ দিক পানেই বারে বারে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাই মনোরঞ্জনের দ্বন্দ্বের সমাধান দিতে পারেনি। আমরা তাঁর সঙ্গী এবং উত্তরসুরীরা সচেতন ভাবে ঐ দিকে এগিয়ে গিয়ে মনোরঞ্জনের অতৃপ্ত আকাঙ্খা ও স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করবো, এই প্রতিজ্ঞাই আজ শহীদ মনোরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি মনোরঞ্জন স্মৃতি সংঘের একমাত্র শ্রদ্ধার্ঘ।

শহীদ মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য জিন্দাবাদ।

Scanned with OKEN Scanner

মনোরঞ্জন স্মৃতি সংঘ

কালিকাপুর, বারাসত, ২৪পরগণার পক্ষে
অনুকূল চ্যাটার্জি (ইন্দুদা) এবং মণি গুহ কর্তৃক প্রকাশিত
এবং ডি, জি, প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি সিণ্ডিকেট, ৩/২-এ, চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলিকাতা-২৫
হইতে মুদ্রিত। ফোন ঃ ৪৫-৭৩৯০/৪৭-৫২৪০

Scanned with OKEN Scanner